নদীপাড়ের কয়েকটি জীবন

নন্দিতা আচার্যচক্রবর্তী

আজ কিছু একটা আছে, মানে ভালো দিনটিন হবে আর কি। ফেরিঘাট থেকে দুশো হাত দূরের স্নানের ঘাটটা স্নানার্থীদের ভিড়ে ভর্তি। অধিকংশই স্ত্রীলোক, পুষও কিছু আছে। বাবলু শক্তপোক্ত কাঠের সাঁকো শু হওয়ার মাথায় ঠেকেথাকা চওড়া সিঁড়িটায় এসে দাঁড়ালো। পল্টুদা কাঠের নড়বড়ে ছোট্ট টুলটায় বসেছিল, ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। সমীহ করে' অথবা একনিষ্ঠতা দেখানোর জন্য। একটা বোট প্রায় জেটির কাছে এগিয়ে আসছে, মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে হয়তো। তারপর বোট চালকের সহযোগী তড়াক্ করে লাফ দিয়ে নেমে দড়ি টেনে জেটির খুঁটিতে বাঁধবে। জোয়ার থাকলে অনেক এগিয়ে আসে, তখন যাত্রীরা নৌকা থেকে কাঠের সাঁকোতে পা দিয়ে সহজেই নামতে পারে; কিন্তু ভাঁটার সময় হয় যত বিপত্তি, তখন ভট্ভটিগুলো সাঁকো অব্ধি পৌছতে পারেনা। যাত্রীদের এবড়ো, খেবড়ো জায়গায় নামতে হয়। তারজন্য একটা চওড়া বেঁটে কাঠের টুলের ব্যবস্থা আছে। ওটাই পাদানিহিসাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রথম বোট চলে ভোর ছ'টায়। শেষ বোটটি থামে রাত দশটায়। কত ধরণের লোক যে যাতায়াত করে। অনেকেই নিত্যযাত্রী। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে অফিসযাত্রী দু-একজন বাজারওলা, ফেরিওলা। এছাড়া নতুন মুখও থাকে।

টিকিট বিক্রেতা এবং টিকিট পরীক্ষক রয়েছে দুই দুই করে চারজন। ভোর ছ'টা থেকে দুটো এবং দুটো থেকে দশটা, এই হল ডিউটি আওয়ার। ঘাটের একধারে জানলা লাগানো বিবর্ণ হলদে কুঠরি ঘরটা টিকিট কাউন্টার। সকালে বসে ল্যাংড়া কালুদা। বিকেলে আসগর চাচা। দুটোর পর যখন ডিউটি অফ্ হয়ে যায়, কালুদা বাড়ি গিয়ে বৌয়ের সঙ্গে হাত লাগায় তেলেভাজা ফুলুরির মালমশলা তৈরীতে। বিকেল থেকে রাস্তার কোণে বড় মুখওলা উনুন পেতে স্বামী- স্ত্রী বসে যায় তেলেভাজা বিক্রী করতে। বাবলুই অমিতদাকে জায়গাটা করে দিয়েছে। বোসদের বাড়ির তলায় যে বড় মেডিকেল স্টোর্স আছে তারই পাশ দিয়ে একচিলতে জায়গা। কিছুটা রাস্তা, কিছুটা দোকানের সামনে ছড়ানো জায়গার একটুকরো অংশ। দোকানের মালিক এবং বোসেদের আপত্তি ছিল, কিন্তু বাবলুর স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচামেচি করার সাহস পায়নি।

আসগর চাচা সকালটায় ইরফান আলির 'রেওয়াজি খাসি'র দোকানে বসে। সেখানে ছুটির দিনতো বটেই এমনকি অন্যদিনগুলোতেও ভিড় লেগে থাকে। আসগর ছাড়াও আরো একটি অল্পবয়সী ছেলে কাজ করে ওখানে।ভোরবেলাই ওরা চান করে ধোয়া জামাকাপড় পরে দোকানে যায়। পরিষ্কার না হয়ে তো আর জবাই করা যায় না! বেলায় যখন দোকান ধোয়ামোছা করে বাড়ী ফেরে, তখনও আর একবার চান করে। তারপর নাকেমুখে গুঁজে আবার ফেরিঘাটে ছোটে। আসগরের দুটো মেয়ের বিয়ে বাকী। ছেলেদুটোও ছোট। সকালে যে হাত দিয়ে বিশাল সাইজের খাসি কাটে, বিকালে সেই কঠিন হাত দিয়েই পলকা টিকিট এগিয়ে দেয়। এই পার্টটাইম কাজটা আসগরের সংসারের অনেক চাহিদাই মেটায়।

পল্টে ডিউটি শেষ হলে ঘাট থেকে বাড়ি যায় না। সোজা 'অনুপম' অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যায়। ওখানে কেয়ারটেকারের কাজ করে। বৌ টিফিন ক্যারিয়ারে করে দুপুরের খাবারটা ওখানেই নিয়ে আসে। সকালের কেয়ারটেকার হেমন্ত বেরিয়ে যাওয়ার আগে গেট এবং তার সংলগ্ন কেয়ারটেকারের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটির চাবি দিয়ে যায়। ঘরের ভেতর তত্তপোষ। মাথার ওপর শীত ছাড়া সব ঋতুতেই বন্বন্ করে ফ্যান ঘোরে। স্বামী - স্ত্রীতে সেখানে বসে দুপুরের খাওয়া সারে। বাড়ীতে

কুঁচোদুটোকে রেখে আসে বলে বৌ তাড়াতাড়ি আবার চলেও যায়।
পল্টা বেরিয়ে যাবার পরে নড়বড়ে টুলটা অধিকার করে গণেশ। ওর এক কানের ফুটোতে সোনালী রঙের একটা ছোট রিং। অপর কানটা অবশ্য খালি। লোহা জায়গায় জায়গায় জং পড়ে গেলে যেমন দেখতে লাগে সেরকম জৌলুসহীন বিবর্ণ একমাথা চুল। চলতি এক জনপ্রিয় হয়ে ওঠা হিন্দি নায়কের মত উল্টো আঁচড়ানো পরনে চকচকে টেরিকট প্যান্ট। রঙদার ঢলঢলে সার্ট অথবা টি- সার্ট, যেটা মডেল বা নায়কদের মতই ওই যাকে বসে 'স্কিন টাইট'। এতে ওর অপুষ্টিজনিত পাকানো চেহারাটা আরো কণ হাস্যকর হয়ে ওঠে। অবশ্য তাতে গণেশের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হাতে ধরা থাকে ব্যাটারিচালিত এফ. এম. রেডিও। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু উঁচু আওয়াজে যেটা বাজতে থাকে সবসময়। ডান হাতের স কব্জিতে বাঁধা থাকে চওড়া বেল্প এক ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি। মেয়েদের রিস্টলেটের মত যেটা ঢক্‌ঢক্ করে। মুখে গুট্‌খা বা তিরঙ্গা। মাঝেমাঝেই সাঁকোর রেলিং ধরে মাথাটাকে নামিয়ে দিয়ে মা গঙ্গার পবিত্র জলে পিচিক্ করে থুতু ফেলে।
বাবলু কিছুতেই গণশাকে কাজটা দিতে চাইছিল না। আগে যে ছেলেটা টিকিট নিত সে দেশে চলে গেল। দুপুরের পর থেকে খেয়াঘাটে টিকিট নেওয়ার লোকের অভাব। একে তাকে ধরে কাজ চালানো হচ্ছিল। গণেশ গিয়ে বাবলুদাকে চেপে ধরলো। কাজটা যদি ওকে দেয়। প্রথমদিনতো নাক কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে ভাগিয়েই দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জুতসই তেমন কাউকে না পেয়ে কতকটা নিপায় হয়ে কিছুদিনের জন্য গণেশকে রাখা হয়েছিল। বছরখানেক হতে চললো ও টিঁকে রয়েছে। এখন বাবলুদাও ওর কাজে খুশী। আসলে গণেশের বয়স অল্প, আটঘন্টা ধরে ও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবে কিনা এই নিয়ে একটা সন্দেহও ছিল। তার ওপর গণেশ সকালে উঠেই যে কাজটা করে তার সঙ্গে এ কাজটাকে মেলানো যায় কিনা তা নিয়েও দ্বিধা ছিল। ভোরবেলা ওর মা কম্‌লি ঘুম থেকে উঠেই জনতা স্টোভে কালিপড়া সস্‌প্যানটা বসিয়ে দেয়। তিনভাগ জলের সঙ্গে মাদার ডেয়ারি দুধ। টগ্‌বগিয়ে উঠলে মুঠো ভরে চিনি ফেলে দেয়। তারপর লালচে লালচে গুট্‌লি পাকানো চায়ের পাতা খামচা খানেক ফেলে দেয়। ধোঁয়াওঠা গরম চা কাচের গেলাসে ঢেলে ঢেলে ওদের চার ভাইয়ের হাত ধরিয়ে দেয়। গতরাতের নেশায় চুর বাপ্‌কে খিস্তি দিয়ে ঠেলে গুঁতিয়ে তুলতে তুলতে ফুলছাপ সিন্থেটিক শাড়ি পরে নেয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই গণেশদের বাড়ি বিলকুল খালি হয়ে যায় মা বাপ মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে যায়। ওরা ওখানকার হাজারখানেক টাকা মাইনে পাওয়া জমাদার জমাদারনী। গণেশ, ওর দাদা এবং পরের দুটো ভাই সবকটাই পিঠোপিঠি, বেরিয়ে পরে শহরে গড়ে ওঠা ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর জমানো ময়লা জড়ো করে ভ্যাটে ফেলার জন্য ওদের বড় বড় বালতিতে বাড়ির কাজের লোকেরা ময়লা ঢেলে দেয়। ওরা সেগুলো নিয়ে নিচে রাখা চারচাকার ঠেলা গাড়িতে ভরে ঠেলে ঠেলে আবর্জনা ফেলার ভ্যাটে নিয়ে যায়। মোট মোটা শলার ঝাঁটা ধরা আর ময়লার বালতি বওয়া হাতদুটো দুপুরের পর থেকে আস্তে আস্তে শুদ্ধু হয়ে ওঠে। বাড়িয়ে দেওয়া টিকিটগুলো নেওয়ার সময় কোনভাবে কার হাতে ঠেকে গেলেও চম্‌কে ঘেন্নায় হাত সরিয়ে নেয়না কেউ শুধু কোন যুবতী বা কিশোরী হলে বিরক্তিতে চোখ কুঁচকোয়। আসলে সে সময় গণেশ খানিকটা ইচ্ছে করেই হাত ঠেকিয়ে দেয়। বাবলুদা জানলে অবশ্য কপালে দুঃখ আছে।
লঞ্চঘাটে একটা চক্কর দিয়ে বাবলু রাস্তায় নেমে এল। পাশের স্নানের ঘাটটার কাছে কয়েকমূহুর্ত থামলো।বহু মহিলা চান করছে। কেউ কেউ আবার ঘাটের ধারেই অন্য কাউকে দিয়ে শাড়ির আড়াল করে ভিজেপোষাক ছেড়ে শুকনো জামাকাপড় পরে নিচ্ছে। পাশে একটা ঘেরা জায়গা আছে মেয়েদের জামাকাপড় ছাড়ার জন্য। কিন্তু প্রায়ই এসব দিনে সে জায়গাটা ইচ্ছে করে নোংরা করে রাখে পাড়ার বখাটে ছোকরাগুলো কাকে কি বলবে। সবকটা বেয়াদব বদমাশ। মেয়েদের বুক, পিঠ, উ দেখার জন্য....। বাবলু থম্‌কে থাকা পা দুটোকে সচল করলো। আশেপাশের অকর্মণ্য বসে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো ওকে দেখেই পিঠটান দিতে শু করেছিল। কাল অনেক রাত অব্দি পার্টি অফিসে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছিলো। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, থ্যালাসেমিয়ার জন্য ফাংশন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ততার রাত বেড়ে গেছিলো, আর বাড়ি ফেরেনি। পার্টি অফিসেই শুয়ে পড়েছিল। আরো কয়েকজন ছিল। গল্প, আড্ডা, টিভি দেখা নিয়ে রাতটা ভালোই কেটেছে। বাড়িতে থাকলে আজ কি তিথি, কেন পুণ্যস্নান এটা জান যেত অবশ্য। কারণ বাবলুর বাবা এখানকার পরিচিত ঠাকুরমশাই। রোজকার পূজোআর্চা থেকে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন সবরকম কাজই তার থাকে। এই করেই তো চারটে ছেলেমেয়েকে বড় করলো। বড় করলো মানে বয়স বেড়ে বড় হয়েছে। আর কোনদিকে নয়। দেশে থাকতে বাবা শখের মাস্টারি করতো। বাপঠাকুরদার জমিজমা ছিল অনেক। কিন্তু বাহাত্তরের রায়টের সময় সবকিছু ছেড়েছুড়ে এখানে

পালিয়ে আসতে হল। বাবলুর তখনও জন্ম হয়নি। দুটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে এখানে ওখানে ঠোক্কর খেতে খেতে অবশেষে এক জায়গায় এসে স্থির হয়। গ্রাম সম্পর্কের এক দাদার সূত্রে ছোট মফস্বল জুটমিলে হিসাবপত্র রাখার একটা চাকরী জোটে। বাবলুর বাবা শিবেনের কাছে তখন তা-ই বেঁচে থাকার জিয়নকাঠি। চাকরিসূত্র ধরেই সেই শহরের পাঁচ ভাড়াটের সঙ্গে মাথা গোঁজার কোনরকম একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধা। তাও ঘর পেতে অসুবিধা হয়েছিল প্রচুর, বাঙাল উদ্বাস্তু বলে। অনেক কষ্টে সেই পাড়াতুতো সহৃদয় দাদাই জোগাড় করে দিয়েছিল। অন্য ভাড়াটিয়ারা কেউই ব্রাহ্মণ ছিল না। কোজাগরী লক্ষীপূজো বা সরস্বতী পূজো, কোন একটা দিন স্বাভাবিক নিয়মেই পুত ঠাকুরের বড় অভাব দেখা দিয়েছিল। সে-রকম একদিন থেকেই বাবার পুতগিরি শু। তারপর জুটমিলের চাকরী থেকে ধীরে ধীরে বাবা সেদিকেই বেশী ঝুঁকলো। ততদিনে বাবলু এবং ওর পরের বোন বুনির জন্ম হয়ে গেছে। মায়ের অনেক খোসামোদ কান্নাকাটির পর ধার- ধোর করে গঙ্গার পাশে জেলেপড়া আর হিন্দু - মুসলমান - বিহারী - বাঙালী - ওড়িয়া মিশ্রিত বস্তি অঞ্চলের পাশে কাঠাখানেক পড়ে থাকা জমি বাবা প্রায় জলের দরে কিনে ফেললো। তারপর ওই যে বলে না, বাড়ি করার টাকা ভূতে জোগায় --- কিভাবে যেন পাঁচ ইঞ্চির গাঁথনি দিয়ে ঘরও গাঁথা হয়ে গেল। চতুর্দিকে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হল। ওরা মহাউৎসাহে নতুন বাড়িতে গেল। বাড়ি বাদে পড়ে থাকা জমিটুকুতে মা মনের সুখে নানা গাছ লাগাতে থাকলো। সেদিকে তাকিয়েই ওর বাবা মা দেশের বাড়ির বাগান, গাছপালার দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করেছিল। আজ এ অঞ্চলটা দেখে কে বলবে একসময় এসব জায়গা খাঁ খাঁ করতো। যদিও ফেরিঘাট তখনও ছিল। সারাদিন খুব লোকজন যাওয়া আসা করতো। এখন এখানে একটুকরো জমিও পড়ে নেই। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে প্রচুর লোকজনের বাস। ফ্লাইওভার হওয়ার জন্য বাস বাড়ির কাছ দিয়েই যাচ্ছে। সঙ্গে প্রচুর অটোও চলছে। ঝলমলে দোকানে রাস্তা আলোকিত হয়ে থাকে। বাবলু ছোটবয়সেও এত জাঁক দেখেনি। মাত্র পনেরো-ষোল বছরেই একেবারে হাল ফিরে গেছে। অবস্থাপন্ন উঠতি বড়লোক থেকে সাধারণ ছাপোষা চাকুরীজীবী, সবাই গঙ্গার ধারে বাড়ি দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রোমোটারের একটা ফ্ল্যাটও খালি থাকে না। বাবলুকেও তো কয়েকজন ধরেছে ওদের বাড়িটা দিয়ে দেওয়ার জন্য; পরিবর্তে ঝক্‌ঝকে আধুনিক ফ্ল্যাট, ক্যাশটাকা এমনকি তলায় একটা দোকান ঘরও পাওয়া যেতে পারে। বাবলু মাকে রাজী করিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বাবাকে বললেই প্রথমে কুটিল ভ্রুকুটি করে তাকাবে এবং তারপর যথারীতি দুটো গা জ্বালানো কথা বলবে। লোকটা কাউকে বিশ্বাস করে না। বাবলুর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। এই মন নিয়ে আবার পূজোআর্চা করে! বাবা হয়েছো, জন্ম দিয়েছো, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাববে না? বাবলু কোনদিনই অংকে ভালো না, তাও ভবিষ্যতে চাকরীর আশায় জোর করে কমার্স নিয়ে ভর্ত্তি হল। সাধারণ বাড়ির, একেবারে সাধারণ মেরিটের, সাধারণ চেহারার ছেলে। তবু তখন ইচ্ছে হত কার চোখে অসাধারণ হয়ে ওঠার। কলেজে লিডিং পার্টির অফিসে যাতায়াত, ইউনিয়নের দাদারাও ওকে দিয়ে উদয়াস্ত খাটিয়ে নিত। অ্যাকউনটেন্সি আর ইংরাজী, এই দুটোর জন্য অন্তত কোচিংএর প্রয়োজন অনুভব করতো। অনেক বলে বলে একটা টিউশনির অনুমতি পাওয়া গেছিলো। চিরকাল অঙ্কে গোলা- মাথা বাবলু অ্যাকাউন্টস পড়ার জন্যই কোচিং - এ ভর্ত্তি হল। কলেজের অনিয়মিত ক্লাশ, পার্টির কাজ এবং প্রেমে পড়া, সব মিলিয়ে নিট্ রেজাল্ট হল হায়ার সেকেন্ডারিতে ইংলিশে ব্যাক। রেজাল্ট দেখে বাবা ভয়ঙ্কর খিঁচিয়ে উঠেছিল। ''হারামজাদা ছেলে, এই রেজাল্ট কইর‍্যা আমার মুখে চুনকালি মাখাও? কতজনেরই তো প্রাইভেট পড়নের পয়সা থাকেনা, তারা সকলে রেজাল্ট ভালো করেনা?

বুনির বয়স কত হবে? বাবলু হিসাব করে, সাতাশ। গত কয়েকবছর ধরেই পাত্রপক্ষের আনাগোনা চলছে।কিন্তু ঠিকমত লাগছে না। তবে সেদিন মা ওকে ফিস্‌ফিস্ করে বলছিল এক জায়গায় মোটমুটি কথা এগিয়েছে। পাত্র প্রাইমারী স্কুল মাস্টার। গ্রামে জমি জায়গাও রয়েছে। বড়দি, জামাইবাবু আর বাবা গিয়ে ছেলের বাড়িঘর দেখেওএসেছে। আজ ছেলের বাড়ির লোকজন আসবে। বাবলুকেও থাকতে বলা হয়েছে। এই বড়দিই যখন পালিয়ে গেছিলো বাবা বলেছিল হারামজাদির মুখ দেখবো না কোনদিন'। বিয়ের পর থেকে জামাইবাবুর ব্যবসারও উন্নতি হয়েছে, আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে গেল। এখন তো জামাইবাবুই এ বাড়ির প্রধান.... মুখের পেশীগুলো আবার কঠিনহয়ে উঠলো। জামাইবাবুর বুদ্ধিতেই কি বাবা বাড়িটা প্রোমোটারের কাছে দিতে চাইছে না? জামাইবাবু কি নিজেই প্রোমোটারী করার ধান্দা আঁটছে! বিশ্বাস নেই। মা এখনো আক্ষেপ করে ওপার বাংলা থেকে এখানে এসে নতুন চাকরীতে ঢোকার সময় বাবা যদি কয়েকবছর বয়স কমিয়ে নিতে! আরো কিছুদিন চাকরী থাকতো তাহলে। বাবা নাকি আঁতকে উঠেছিল 'নরকে যামু না কি!' এদিকে ফর্সা

হওয়ার ক্রিম আর হলুদবাটা মেখে চামড়ার যত্ন নেওয়া মেয়েকে পাত্র পক্ষ দেখতে এলে মা অবলীলায় বছরখানেক বয়স কমিয়ে বলে। কয়েকবার গাড্ডা মেরে বুনি অবশেষে বিএপাশ করেছে। তাতে সুবিধাই হয়েছে। ওর কামানো বয়সটা পড়াশোনার সঙ্গে খাপে খাপে মিলেও যায়। এ বিষয়ে বাবার প্রতিবাদ তীব্র থেকে মৃদু হয়ে এখন একেবারেই থেমে গেছে। বাবলু ভাবে, বাবা লোকটা কেমন? সততা বজায় রাখা বেশ একটা 'মহৎ মহৎ' ভাব। কিন্তু স্ট্রিক্টলি সেটা মেনটেন করল না কেন? আর যদি আলগাই দেবে, তাহলে আরো কিছু বিষয়েও তো আলগা হলে আখেরে ওদের উন্নতিই হোত। বাবলু ভাবতে চায়না যদিও, তবু মনে হয়ে বাহাত্তর সালের পরও রিফিউজি হয়ে এসে আরো দুটো ছেলেমেয়ের বাবা হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, নয় ছেলের শখ ছিল; বাবলু হয়েইতো তা মিটিয়েছিল। তারপরেও আবার বুনি হল। বাড়িতে সংসার খরচ নিয়ে বাবার সঙ্গে মায়ের রোজই খটাখটি লেগে আছে। একটা টাকারও হিসাব দিতে হবে। এদিকে বিয়ে, পৈতে থেকে নানান পূজোপার্বণে কে কি দিল, বাবা তা নিয়েও মাথা ঘামায় না। সুযোগ বুঝে বহু মানুষই অন্যদিকে প্রচুর জাঁকজমক করলেও বাবার পাওনা কাটল্ করে। শুধু মেকি একটু শ্রদ্ধাভক্তির গদগদ ভাব দেখায়। বাবা তাতেই মহাতৃপ্তি পায়। নিজের ছেলেমেয়ের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা,; আর বাইরের লোকের আচরণে কোন সন্দেহ হয় না? অবশ্য কয়েকজন, খুবই কম সংখ্যায় তারা, সত্যিই শ্রদ্ধাভক্তি করে। দেশের বাড়ির সচ্ছলতার সঙ্গে স্কুলমাস্টারীর উপ্রিপাওনা 'সমীহ', তারসামান্য কিছুও এদেশে ফিরে পাবার জন্যই বোধহয় এই নির্লিপ্ত দার্শনিকতা। নাঃ, নিজের জন্মদাতা সম্পর্কে এত খোলাখুলি সমালোচনা, হোক না তা মনের ভেতরে, ঠিক নয় বোধহয়। মোট কথা, বাবার থেকে মাকে বাবলুরঅনেকবেশী স্বচ্ছ মনে হয়। মায়ের রাগ, দুঃখ, ভালোবাসা সবই স্পষ্ট। বাবলুর পৃথিবীতে মা-ই সবথেকে বেশী ভালোবাসার জন। আর কেউ? বাবলু মনের পরত খুলতে থাকে।

এখনো শেষ বোটটা যায়নি। পার্টি অফিসের একটা ছেলেকে অনেক বলে কয়েক দুপুরের পর থেকে টিকিট নেওয়ার জন্য গণ্শার জায়গায় বসিয়েছে। আসলে গণ্শা আজ ছুটি নিয়েছে। ওর বোন মম্তার বিয়ে। বোন মানে মাসতুতো বোন। গণেশের বাপ-মায়ের মত মাসী মেসোও কর্পোরেশনে কাজ করে। মম্তা ওদের নিজের মেয়ে নয়। ময়লা তুলতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া। থানার দারোগাবাবু এবং আশেপাশে সকলকে সাক্ষী মেনে ওর মাসীমেসো মেয়েটাকে নিয়েছিল। পড়ালিখা শিখিয়ে অনেক আদরে বড় করেছে। সাত কেলাসে পড়তো, বছর ষোল সতরো বয়সহবে। গণেশের থেকে বছর খানেকের ছোট, পর পর ছেলে হওয়ার গর্বে গরবিনী ওর মোটাসোটা মা চেয়েছিল ওদেরই কোন ভাইকে মাসী নিজের ছেলে মনে করে পালুক। মায়ের সেই আশায় জল ঢেলেছে মম্তা। তবে গণেশের মনে রঙ ধরিয়েছে সেই 'পর্থম্' ঝড় হাওয়ার সময় থেকেই। সেই যে সাজগোজ, এসট্রা টাইম কাজ করা, সবই তো ওর কথা ভেবে। শালী যেই মিনিসিপালিটিতে কাজ করা পাত্তর দেখেছে, অমনি ঝুলে পড়লো! গণশা তো ওকে নিয়ে পালাতেও চেয়েছিল। শেষকালে কোন উপায় না দেখে মাকে বলে ফেলেছিল। মা অবশ্য একটু আধটু আন্দাজ করতো। গণ্শার মা কম্লী বোনকে বলতে গেছিলো। ভয়ংকর মুখ ঝামটা খেয়েছে। ছটি একেবারে দাঁতমুখ খিঁচিয়েউঠেছিল। 'দেখ্ দিদি অনেকদিন ধরেই দেখছি আমাদের টাকাকড়িতে তোদের ছোঁক্ছোকানি। মম্তাকে পেটে না ধরলেও নিজের মেয়েই তো। গণ্সার বোন লাগে না? তোদের লজ্জা - হায়া নাই?'

এই লজ্জাহায়ার জন্যই শুধু লোকদেখিয়ে গণ্শাকে আজ ছুটি নিয়ে মম্তার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। বাবুদের মত বড় বাড়ি ভাড়া করে বিয়ে হচ্ছে। ফ্রিজ, টিভি, খাটবিছানা, বাসনকোষণ কত কি দিয়েছে! লালশাড়ীতে মম্তাকে একেবারে রাণী মুখার্জীর মত লাগছে। এখন এই প্রায় নির্জন গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে ওকে স্বীকার করতেই হল, বতরটাও সবদিক থেকে গণশার চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু তা হলেই বিয়েতে রাজী হবি? পেয়ার মহববতের জন্যে মানুষ কত কি করছে..... এর দুর্বল খাঁচা অভিমানে ফুলে ওঠে। এতসব ভালো খাবার রান্না হয়েছে, ও একটাও মুখে তোলেনি, তুলবেও না।

দশটা বাজলে, শেষ বোটটা ছাড়ার সময়ে বাবলু ঘাটে ঢুঁ মারতে গেল। এখনো ঠান্ডাটা তেমন পড়েনি। আকাশের বড় করে চাঁদ উঠেছে। ঘাটের বড় চাতালটায় কে দাঁড়িয়ে? গণ্শা না?

'কিরে, তুই বিয়েবাড়ির মস্তি ছেড়ে এখানে?'

গণশার স মুখটা থম্থমে, 'এমনি'। থমথমে বাবলুর মনও। তবে তা চাপা রয়েছে নানা ব্যস্ততার মধ্যে।

আসগরচাচা হিসাব মিলিয়ে টিকিট বিত্রির কুঠুরি বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। অমিতদা ঘাটটা লিজ নিয়েছে। তবে দেখাশুনা সবই করে বাবলু। দূরে শেষ ভট্‌ভটিটার সবুজ আলো কালোজলে ছায়া ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আজন্ম পরিচিত এই নদী। তবু অন্ধকার নামলে প্রতিদিনই সে মোহময়ী হয়ে ওঠে। জলের মধ্যে ওপারের লম্বা প্রতিফলন, ভট্‌ভটি আসা যাওয়ার আওয়াজ, ঘাট সংলগ্ন তেওয়ারীজীর মন্দিরে কখনো নামগান, কখনো মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি বাতাসের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে নদীর ওপরে ভাসতে থাকে।আজকে আবার চাঁদের আলোয় নদী যে ঝরঝরিয়ে হাসছে। ছোটছোট স্রোতের মধ্যে নরম আলোর মাখামাখি। বাবলুর ভারাক্রান্ত মন হাল্‌কা হচ্ছে। ও একটা সিগারেট ধরালো, দু আঙুল দিয়ে গণশার মাথায় একটা টোকা দিল, 'যা ভাগ্‌'

গণশার চোয়াড়ে মুখ কণ লাগছে। চোখটা লাল। কি হল ওর!

আজ বুনির বিয়ের ফাইনাল কথাবার্তা হয়ে গেল। ওখানেই ঠিক হল। দেনাপাওনা বলতে ঘর সাজানোর মত মোটামুটি সমস্ত ফার্নিচার এবং আটভরি অন্তত সোনা। সঙ্গে বেশ কিছু নমস্কারী শাড়ি। সব মিলিয়ে বেশ বড় অংকের খরচের ধাক্কা। বাবা বাড়িটা জামাইবাবুকে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাবলুকে একবার জিজ্ঞাসাও করল না। ও এতই অপাংক্তেয় হয়ে গেছে? জামাইবাবুর চাল এতদিন কিস্তিমাত করেছে। বোনেরাও বোধহয় ভাগ চাইবে। শা-লা, ধারদেনা করে, খরচ করে বিয়ে দাও; আবার সম্পত্তির ভাগও সমান দাও। এদিকে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যের সময় ছেলে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসতে পারে না ---- আরো কত কি ----, ছেলে থাকলে মেয়েদের করাটাও মানায় না। দাঁতে দাঁত পিষে মনে মনে বাবলু একটু জুতসুই গালাগাল খুঁজতে লাগলো।

পার্টির হোলটাইমার হিসাবে বাবলুর কিছু রোজগার আছে। কিন্তু আজও একটা চাকরী পেল না। অবশ্য এদিক ওদিক গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটগুলোতে কন্সট্রাক্সনের সময় সুযোগ পেলে অর্ডার সাপ্লাই করে কিছু কিছু রোজগারহয়। বাবা যাকে 'উঞ্ছবৃত্তি' বলে। কিন্তু তা বলে আকাঙ্খাগুলো মরে যায় না। বরং কোন নিঝুমরাত্রে ওর নিজস্ব ঘরটির অতি ছাপোষা তক্তপোষের ওপর পাতা চেক্‌ চেক্‌ চাদরটা কোন তীব্র আবেগের তাড়নায় সিক্ত করে ফেলে। অথবা এই সব চাঁদ জাগা রাতের কিংবা চাঁদ ডোবা কালো আকাশের অসংখ্য জুলজুলে নক্ষত্র, তার সঙ্গে নদীর শরীরে লাল হলুদ আলোয় ছায়া, ভট্‌ভটির কর্কশ আওয়াজ, সূক্ষ্ম জলকণা বহণকারী ইষৎ ভারী বাতাস ওকে ভীষণ দুঃখীঅথবা ভীষণ সুখী করে তোলে। এখন যেমন প্রায় মিইয়ে যাওয়া সিগারেটটা থেকে আপ্রাণ ধোঁয়া শুষতে শুষতে স্যাঁতসাতে দুঃখগুলো সরিয়ে ও সুখী হতে চাইছে। একটি সাধারণ 'নারী', সুন্দরী আশা করা ওর পক্ষে মানবে না। তাইসে আকাঙ্খাও করে না। শুধু সামান্য স্নিগ্ধতা আর কোমলতা, কিছুটা যদি পারমিতার আদল থাকে তবে তো কথাই নেই, কিন্তু কিবে? ওদের ছিরিছাঁদহীন অতি সাদামাটা ঘরটিতে আলতামাখা দুটি পা, শুধু বর্হিগমনই করবে না, সমাদরে প্রবেশ করবে, বাবলুর সেই 'নিজস্ব নারীর' আগমন সম্ভাবনা কেন দূর অতীত!

গণশার সেই ভীষণ সিদ্ধান্তটা আস্তে আস্তে নমনীয় হচ্ছে। অনেক্ষণ ধরেই মাথার ভেতর কাটাকুটি হচ্ছিল। সব থেকে কম কষ্ট করে কীভাবে 'সুসাড্‌'করা যায়? একমাত্র জলে ডুবে যাওয়াটা বোধহয় কম কষ্টকর। কিন্তু সাঁতারটা যে ও বড্ড ভালো জানে। শেষ সময়ে যদি ভুস্‌ করে ভেসে ওঠে? উত্তেজনায় মেশানো থুতুটা গিলেই ফেললো। আর চিন্তা করা যাচ্ছে না। মাথার মধ্যে কেমন করছে। তার চেয়ে মরে যাওয়ার পর কেমন সিন্‌ হবে সেটা ভেবে ও এত দুঃখের মধ্যেও কিছুটা আরাম বোধ করতে লাগলো। মা গালাগাল টালাগাল দিয়ে ভয়ংকর কাঁদবে। মাসীও কাঁদবে নিশ্চই। আর মম্‌তা? কাঁদবে না? সব কিছু জানাজানি হয়ে যাবে। বরটা ভেগে যেতে পারে। এবার থাক্‌ ইয়েমাগী, কপালে নিন্দেঘেন্নার দাগা নিয়ে। হুঁঃ বেনারসী পরে আদে ডগমগ হয়ে বিয়েতে বসেছে! গণ্‌শা ইচ্ছে করলে এখনই সব ওলটপালট করে দিতে পারে। এসব ভাবনার মধ্যেই শরীরের নিম্নাংশে অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা চাপাট জোর চাগিয়ে উঠলো। এবার প্রায় স্থবির দেহটাকে নাড়াতেই হল। ঘাটের পাশে ঢুলু জমিটাতে নেমে ও মুক্ত হতে গেলে। এখন নদীর ওপর শুন্‌শান। গণ্‌শার বিক্ষিপ্ত মনের মধ্যে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃশ্য ভেসে উঠলো। সেই মেয়েটা গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। গণশাও রোজদিনের মতই জলবিয়োগ করে ভয়ংকর তাড়না অনুভব করছে। মমতা কি তখন ওর হৃদয়ের রাণী থাকে না!.....

বহুদিন আগে পাতলা প্লাস্টিকে ঢাকা এবড়ো খেবড়ো দেয়ালগুলো খুব শীগ্‌গিরই চুণরঙ করা হয়েছে। বুনির জন্য বিভিন্ন পাত্রপক্ষের আনাগোনা চলছিল। বাড়িটাকে একটুখানি সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখলে বড় দীন লাগে, শখশৌখিনতা মরে য

াওয়া শিবেনও তা উপলব্ধি করছিল, তাই কয়েক মাস আগে কলি ফেরানো হয়েছে, আজ আবার বুনির বিয়ের কথাবার্তা ফাইনাল হবে বলে বড় দুইমেয়ে এসে বাড়িটাকে সাধ্যমত সাজিয়েগুছিয়ে তুলেছে, পাত্রপক্ষ বেশ অনেকক্ষণই চলে গেছে, বাড়িতে এখন খুশির হাওয়া, ছোট বড় খুপরী সব ঘরগুলোতেই আজ আলো জ্বলছে, শিবেনও আজ এ নিয়ে মাথা খার াপ করছে না, ওর মনটা বড় উদাস হয়ে আছে, এই সঙ্গে কর্তব্য শেষ করার তৃপ্তির আনন্দ এবং গাঢ় এক শূন্যতার দমচাপ া অনুভূতি পাশাপাশি যেন জায়গা দখলের লড়াইএ লেগেছে। বুনির বিয়েটাই শিবেনের লাস্ট কর্তব্য ছিল, বাড়িটা দিয়ে দিলে খরচখর্চা মিটিয়েও হাতে বেশ কিছু টাকা থাকবে, জামাইএর বন্ধু, কি যেন নাম, প্রোমোটারি করে, সেই নেবে; দক্ষিণখোলা বড়সড় একটা ফ্ল্যাট দেবে, ক্যাশটাকাও বেশ ভালই দেবে, আবার যতদিন না নতুন ফ্ল্যাটে আসছে, ভালো ভ াড়াবাড়ি দেবে, যার টাকা গুনবে প্রোমোটারই। বাবলুওবলছিল ওর পরিচিত কারা যেন সব বাড়িটা নিতে চাইছে, শিবেন সে কথা কানে তোলেনি, ছেলে বিষয়বুদ্ধিতে তেমন পাকাপোক্ত বলে ওর বিশ্বাস হয়না, উপরন্তু কেউ যদি তা বুঝতে পারে, রগচটা ছেলে, বাইরে রাগারাগি করে মাথা ভেঙে আসে কি কী করে, চিন্তা কি একটা! বাবা হয়েছে যে ---- জ্বালা কম নয়। বড় জামাই এসব দিকে খুবই পাকাপোক্ত,শ্বশুরবাড়ির জন্য বাস্তবিকই চিন্তা করে, কিছু স্বার্থ সেখানে থাকতে পারে হয়তো, কিন্তু শিবেনও তার প্রতিটি ছেলেমেয়েকে অনেকখানিই চেনে,বুলা বাপেরবাড়ি অন্তপ্রাণ, জামাই এমন কিছু করবে না যাতে স্ত্রী কষ্ট পায়, দুটিতে বেশ মিলমিশ আছে, অথচ শিবেন কত অশান্তি করেছে, ইন্টারকাষ্ট, আবার স্বপন লেখাপড় াও তেমন করেনি, এদিকে ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে বুলা ছিল পড়াশুনোতে সবথেকে ভালো, দেখতেও সুশ্রী। স্বপনরা এদেশীয়। ওরা শিবেনের মত সব কিছু হারায়নি ব্যবসায়ী পরিবার। অবস্থা শিবেনের চেয়ে অনেকগুণ ভালোছিল, তবুও শিবেন মত দিতে পারেনি, যাইহোক এখন ভালো আছে। স্বপন তো নিজের চেষ্টাতেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে, শি বেন পুরনো ঘটনা ভুলতে চায়। ওরাও বোধহয় ভুলে গেছে, তবু কাঁটার মত এক অস্বস্তি খচখচ করে। প্রত্যেক মেয়েই বিয়ের দিনটি নিয়ে কল্পনার জাল বোনে, কনেসেজে বসার আকাঙ্খা থাকে বোধহয় সবার মধ্যেই, অন্যদুটি মেয়েকে সেই সুযোগ দিলেও, যদিও অতি সাধারণ ভাবে, বড়টিকে শিবেন সেই স্বপ্নপূরণের সাধ থেকে বঞ্চিত করেছে। বুলার যতই আজ থাক না কেন, শিবেন হাতে কিছু থোক পেলে বড়মেয়েকে কিছু দেবে, পারলে অন্য দুটিকেও অল্পস্বল্প। বাদবাকীটা বাবলুর থ াকবে; ফ্লাটটা থাকবে, ছেলের জন্য শিবেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ছেলে মেয়ে কার জন্যই সাধমতো কিছু করতে প ারেনি, সামর্থ্যও ছিলনা, ছেলেটাকে যদি ভালো টিউশান দেওয়া যেতো.....শিবেনেরবুকটা কষ্টে মুচড়ে ওঠে। এতক্ষণে শূণ্যতার কারণটা উপলব্ধি করতে পারে, বরাবরই কি ও ছেলেটার সঙ্গে একটু বেশী ক্ষ ব্যবহার করেছে? আসলে শিবেন চেয়েছিল --- পুষ মানুষ, লেখাপড়াটা ভালো করে শিখুক, অন্তত বড় মেয়েটার মতও যদি হোত, কিন্তু সবাই কি সমান হয়? শিবেনের সেই কত আকাঙ্খার ধন, তার একমাত্র পুত্রসন্তানটি, সেই ডানপিটে মুখচোরা বাবলু..... বাবার ওপর অনেক অভিমান জমা করেছে। শিবেন বারবার ঘর - বার করতে থাকে। 'বাবলু আসে নাই এখনো?' বাবলু রাত করেই ফেরে, তাই ওর ফেরা নিয়ে মা দিদিরা তেমন চিন্তিত ছিলনা, শিবেনের উটকো উৎকণ্ঠা দেখেই বোধহয় বাবলুর মা, যে কিনা এতক্ষণ মেয়ে জামাইদের সঙ্গে ভাবী সুখের দিনগুলোর আলোচনায় বিভোর ছিল, মুখ তুলে একটু অবাক হয়েই বললো --- 'আসবেআনে, হঠাৎ অত চিন্তাকরণের হইলো কি!'

কেউ জানেনা শিবেনের বুকের ভেতর গভীর অপত্য স্নেহ, সন্তানদের ঠিকমত বড় করতে না পারার গ্লানি এবং তারসঙ্গে দেশ ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে জমা বহু পুরোনো আক্রোশ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, সব মিলেমিশে এক বিরাট সমুদ্রর আকার নিয়ে কেবলই ঢেউ ভাঙতে থাকে।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই এক পরিচিত কেঠো হাতের স্পর্শ। বাবলু ভীষণ চমকে গেল। জৌলুসহীন কালোফ্রেমের মোট চশমার ভেতর দুটো বসে যাওয়া চোখের ছলছলে কোমলতা এই আলো আঁধারিতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

'অনেক রাত হইসে, ঘরে চলো মনু। সবাই বইস্যা আছে, একসাথে খামু।'

ঘটনার আকস্মিকতায় বাবলু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তারপরই এক দুরন্ত আবেগের তুফান ওকে প্রবলভাবে এলোমেলো করে দিতে থাতে--- কতদিন, কতদিন পর..... !

কেমন আচ্ছন্নের মত হয়েথাকা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রটিকে বাবা যেন তার সমস্ত মানসিকশক্তি নিঃশেষ করে টেনে তোলে। ওরা টলমলে পায়ে একটা একটা করে সিঁড়িভেঙে ওপরে উঠতে থাকে, শিবেনের ধরেআসা গলা হৃদয়ের কোন গোপনকুঠির

থেকে বেরিয়ে আসে, ‘তুমি আমার বংশরক্ষক। আমার সব আশা ভরসা। তোমারে বাদ দিয়া কিছু না।’
কতশত সময়ের স্রোত পেরিয়ে আজ দুই পুষের, বাবা আর ছেলে, হাতে হাত মিশে যায়। জ্যোৎস্নাময় রাতে কাছাকাছি কে ান বিয়েবাড়ির সানাই -এর সুর হালকাভাবে ভাসছিল। ঘাটের শেষসিঁড়িটা পেরিয়ে রাস্তার ওপর উঠতে গিয়ে বাবলু হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, ‘গণ্শাটাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। ডেকে নিই বাবা?’
বাবা সস্নেহে তার যুবক পুত্রের শীতল করতলটি আরো একটু ঘনভাবে আঁকড়ে ধরে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।
সে সময় আকাশও যেন নদীর ভরাট শরীরে মিশে যাচ্ছিল। নদী আর আকাশ আদে শিউরে উঠছিল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com